ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1536-1544
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.375

পিণ্ডারিদের উত্থান ও বিকাশ ব্রিটিশপূর্ব ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

পুলক সরকার, *স্বাধীন গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This essay analyses the origin, development, and political role of the Pindaris in the period preceding the establishment of British rule. In the context of the Mughal Empire's decline and the rise of Maratha power, the Pindaris first emerged as auxiliary cavalry for various Indian armies. Subsequently, under Maratha chiefs, they became a significant military element by conducting looting and destructive activities in enemy territories. By the end of the 18th century, the weakness of the Maratha Confederacy and the lack of central control helped the Pindaris gradually evolve into an independent force. Under leaders such as Karim Khan Pindari and Chitu Pindari, they began conducting raids for their own interests, and their relationship with the Maratha power became largely strained. Through an analysis of their military structure, social composition, and economic foundation, this essay demonstrates that they were a multi-ethnic and unorganized group whose primary goal was the acquisition of wealth through plunder. At the same time, their internal conflicts, lack of centralized leadership, and mutual rivalries weakened their political stability. In conclusion, it can be said that even before British rule, the Pindaris had emerged as a significant yet volatile force, whose rise and development were deeply connected to the political instability and power shifts of contemporary India.

Keywords: Pindari, Maratha, British, Politics, Military, Plunder, Power

১

পিণ্ডারি– ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের কাছে খুবই চেনাপরিচিত একটি নাম, অথচ ইতিহাসের তাঁদের ব্যাপারে তথ্যের থেকেও বেশি কুখ্যাতি বিদ্যমান। সমসাময়িক ব্রিটিশ লেখকদের দৃষ্টিতে তাঁদের কর্মকাণ্ড প্রায়ই তৎকালীন সতীদাহ, শিশুহত্যা এবং মানববলির মতো প্রথার সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। ব্রিটিশদের কথানুযায়ী তাঁদের সভ্যতা, শান্তি ও সমৃদ্ধির আগমনের এক প্রতিবন্ধকতা ছিল পিণ্ডারি। সেই কারণে পিণ্ডারিদের নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণা করাও যথেষ্ট কঠিন এক বিষয়। তাঁদের সম্পর্কিত ব্রিটিশ বর্ণনাগুলো তাঁদের নিজস্ব পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে অনেকক্ষেত্রে বিকৃত হয়েছে, অন্যদিকে তাঁদের প্রাথমিক ইতিহাসও বেশ অস্পষ্ট। তাঁরা নিজেদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কোনো লিখিত নথিও রেখে যাননি। ইতিহাসে সেন এবং সরদেশাইয়ের মতো গবেষকেরা সীমিত সংখ্যক প্রাথমিক উৎস বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের গবেষণার ফলেও উল্লেখযোগ্য কোনো নূতন তথ্য সামনে উঠে আসেনি। নির্ভরযোগ্য উৎসের অভাব এবং নূতন কোনো উৎস আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করা বর্তমানে সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন ঐতিহাসিক ফিলিপ এফ

ম্যাকএল্ডোনির।[১] আজকের এই প্রবন্ধে সেই কারণে তথাকথিত ব্রিটিশ পিণ্ডারি সংঘর্ষের দিকে না গিয়ে ব্রিটিশপূর্ব পিণ্ডারিদের ইতিহাস অনুসন্ধান করার সামান্য প্রচেষ্টা করলাম।

পিণ্ডারিদের উদ্ভব ঘটে আনুমানিক খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাদ এবং ক্রমে তাঁরা ভারতীয় বিভিন্ন সেনাবাহিনীর সহায়ক বাহিনী (auxiliaries) হিসেবে গড়ে ওঠে। তবে দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের উৎপত্তি ও প্রাথমিক ইতিহাস বেশ অস্পষ্ট। প্রাথমিক সূত্রগুলিতে যে অল্প কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে কেবল কিছু অনুমান করা সম্ভব হয়। এমনকি "পিণ্ডারি" শব্দটির অর্থ নিয়েও ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী, পিণ্ডারি শব্দটি এসেছে *পিণ্ডা* থেকে, যা একটি মাদকজাতীয় পানীয় ছিল এবং পিণ্ডারিরা প্রায়ই সেটি পান করতেন। অনেক পিণ্ডারিই মনে করত যে তাদের নামের উৎস এই পানীয় থেকেই এসেছে।[২] আরও দুটি সম্ভাব্য উৎস হলো হিন্দি ও মারাঠি ভাষার *pendha hare* এবং *pind parna* শব্দগুচ্ছ। প্রথমটির অর্থ "যে খড়ের আঁটি সংগ্রহ করে।" এটি সেই কাজের প্রতি ইঙ্গিত করে, যা পিণ্ডারিরা কখনও কখনও সেনাবাহিনীর জন্য ঘোড়ার খাদ্য সংগ্রহকারী হিসেবে করতেন। দ্বিতীয়টির অর্থ "ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা" বা "মৃত্যু পর্যন্ত অনুসরণ করা।" এটি ইঙ্গিত করে যে পিণ্ডারিরা অনেকসময় কোনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার পেছনে পেছনে চলতেন।

Pandhar এবং *Bidaris* শব্দদুটিও দুটি ভৌগোলিক অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেগুলোর সঙ্গে পিণ্ডারিদের সম্ভাব্য যোগসূত্র থাকতে পারে। তবে *Pandhar* সম্পর্কিত তত্ত্বটির পক্ষে খুব বেশি প্রমাণ নেই, কারণ নর্মদা নদীর তীরবর্তী এই অঞ্চলটি পিণ্ডারিরা জমির অধিকার লাভ করার অনেক পরে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।[৩] এর আগে তারা দাক্ষিণাত্যের আরেকটি অঞ্চল, অর্থাৎ বিদার অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। তাই ধারণা করা হয় যে "পিণ্ডারি" শব্দটি সম্ভবত *Bidari* শব্দের বিকৃত রূপ, যার অর্থ বিদার অঞ্চল থেকে আগত মানুষ। একটি সম্ভাব্য ধ্বনিগত পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা হতে পারে— *Bidari* থেকে *Bindari,* এবং সেখান থেকে *Pindari*। উল্লেখযোগ্য যে এই অঞ্চলটিতেই প্রথম লেখকেরা পিণ্ডারিদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন।

এই বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি একত্রে পিণ্ডারিদের একটি মৌলিক সংজ্ঞা প্রদান করে। পিণ্ডারিরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংগঠিত একদল অশ্বারোহী যোদ্ধা, যাঁরা কোনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শত্রুপক্ষের অঞ্চল ও শিবিরে লুটতরাজ চালানো এবং তাদের হয়রানি করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো। তাঁদের উৎপত্তি দাক্ষিণাত্যের বিদার অঞ্চলের আশেপাশে বলে মনে করা হয় এবং পরবর্তীকালে তাঁরা এমন একটি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন, যা একসময় *Pandhar* নামে পরিচিত ছিল। তাঁদের অস্তিত্বের শেষ পর্যায়ে তাঁরা ধীরে ধীরে কোনো নির্দিষ্ট সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন এবং এরপর তাঁরা নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন অঞ্চলে লুঠতরাজ শুরু করেন— সেটি শত্রু অঞ্চল হোক বা না হোক।

এই মৌলিক সংজ্ঞার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে এই ধরনের গোষ্ঠী ভারতীয় রাজনীতি ও সামরিক ব্যবস্থায় নতুন কিছু ছিল না। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত দুটি সুপরিচিত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোনো রাজাকে তার শত্রুর বিরুদ্ধে কৌশল হিসেবে দস্যু ও চোরদের ব্যবহার করা উচিত।[৪] যদিও এগুলো মূলত একজন রাজাকে কী করা উচিত সেই বিষয়ে নির্দেশনা দেয়, তবুও সম্ভবত এগুলো কোনো না কোনোভাবে বাস্তব পরিস্থিতিকেও প্রতিফলিত করে। এই কারণেই ধারণা করা যায় যে অনেক শাসক তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্যসাধনের জন্য এ ধরনের গোষ্ঠীকে ব্যবহার করতেন।

ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার পর তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তারাও ধীরে ধীরে তাদের পূর্বসূরিদের মতো এই ধরনের সামরিক গোষ্ঠীকে নিজেদের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে এ ধরনের

একটি দল তাদের সেনাবাহিনীর অংশ হয়ে ওঠে। পিণ্ডারি ইতিহাসের এই কম পরিচিত সময়কালটিকে পরবর্তী দুই পর্যায়ের তুলনায় "মুসলিম যুগ" হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এর পরবর্তী পর্যায়, অর্থাৎ "মারাঠা যুগ"-এ মারাঠা প্রধানেরা পিণ্ডারিদের নিজেদের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে। অবশেষে "স্বাধীন যুগ"-এ পিণ্ডারিরা ধীরে ধীরে মারাঠা নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং নিজেদের স্বার্থে স্বাধীনভাবে লুটতরাজ শুরু করে।

মুসলিম ইতিহাসবিদ মহম্মদ কাশিম ফেরিস্তা প্রথমবারের মতো ১৬৮৯ সালে দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেবের অভিযানের সময় "পিণ্ডারি" নামটির স্পষ্ট উল্লেখ করেন।[৫] একই সময়ে আরেকটি সূত্রে বলা হয়েছে যে বিদারি বা পিণ্ডারিরা মুঘল সেনাবাহিনীর সঙ্গে "স্বীকৃত ও বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত চোর" হিসেবে অগ্রসর হতেন। ইতালীয় অভিযাত্রী নিকোলাই মানুচির মতে তাঁরা হতেন শত্রুর ভূখণ্ডে প্রথম আক্রমণকারী, যাঁরা যা পেতেন তাইই লুঠ করে নিয়ে যেতেন।[৬]

২

পরবর্তী "মারাঠা যুগ"-এর ক্ষেত্রেও উৎস উপাদান প্রায় মুঘল যুগের ন্যায় সমানভাবে সীমিত। মারাঠারা শিবাজীর সময়ে পিণ্ডারিদের তেমন ব্যবহার করতেন না। তবে সম্ভবত বালাজী বাজিরাওয়ের শাসনকালে মারাঠারা প্রথম পিণ্ডারিদের ভাড়াটে যোদ্ধা হিসেবে নিয়োগ করে, এবং সেই সময় তাদের নেতৃত্বে ছিলেন পিণ্ডারি নেতা গর্দি খান।[৭]

পিণ্ডারিরা কেন মুঘলদের পক্ষ ত্যাগ করে মারাঠাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সম্ভবত পিণ্ডারিরা মুঘলদের কঠোর নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, অথবা তাঁরা মনে করেছিলেন যে মারাঠাদের অধীনে লুটতরাজের সুযোগ আরও বেশি এবং লাভজনক হবে।[৮] তাই হয়তো তাঁরা এইসময় থেকে মারাঠা সেনাবাহিনীর একটি নিয়মিত অংশে পরিণত হয়েছিলেন।

পুনে দরবার যশবন্ত হোলকার এবং দৌলত রাও সিন্দিয়ার ন্যায় মারাঠা নেতাদের নিজ নিজ শিবিরে নির্দিষ্ট সংখ্যক পিণ্ডারি রাখার অনুমতি দেয়। মারাঠা সামরিক ব্যবস্থার মধ্যে পিণ্ডারিরা অশ্বারোহী বাহিনীর চতুর্থ শ্রেণি (খাসগি পাগা, শিলেদার এবং একান্দাসের পর) হিসেবে বিবেচিত হতেন।[৯] অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে এই ব্যবস্থার অধীনে পিণ্ডারিরা মারাঠা প্রধানদের জন্য আয়ের একটি উৎসে পরিণত হন। মারাঠা প্রধানেরা তাঁদের সুরক্ষা দিতেন এবং মারাঠা সেনাবাহিনী যে সব অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতো সেখানে পিণ্ডারিদের লুটতরাজ করার অনুমতি দিতেন। এর বিনিময়ে পিণ্ডারিরা মারাঠা প্রধানদের "পালপট্টি" নামক একটি কর প্রদান করতেন।[১০] আসলে পিণ্ডারিরা দক্ষ অশ্বচালক, লুটেরা এবং স্বাধীনচেতা হবার কারণে মারাঠারা তাঁদের নিজেদের সুবিধার্থে পিণ্ডারিদের ব্যবহার করতেন।[১১]

পিণ্ডারিদের সঙ্গে এই ব্যবস্থা মারাঠাদের জন্য ততদিন পর্যন্ত লাভজনক ছিল, যতদিন মারাঠা সেনাবাহিনী একটি সুসংগঠিত বাহিনী হিসেবে রাষ্ট্রের স্বার্থে কাজ করছিল এবং যতদিন শক্তিশালী মারাঠা প্রধানেরা পিণ্ডারি ও তাঁদের বাহিনীকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে মারাঠা নেতৃত্বের অবনতি ঘটে এবং তুলনামূলকভাবে অযোগ্য ব্যক্তিরা শাসনক্ষমতায় আসতে শুরু করে। তাদের অধীনে মারাঠা কনফেডারেসির ঐক্য ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রতিটি প্রধান নিজের এলাকায় কর্তৃত্ব বজায় রাখতে এবং নিজেকে কনফেডারেসির প্রধান নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

এই পরিস্থিতিতে শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে পিণ্ডারিদের সংখ্যা ও সম্পদ উভয়ই দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাদের চরিত্রও উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়। তারা আর কেবল কোনো সেনাবাহিনীর সহায়ক বাহিনী হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং নিজেদের নেতাদের অধীনে তারা একটি আধা-স্বাধীন অশ্বারোহী বাহিনীতে পরিণত হয়, যাদের

মারাঠা প্রধানদের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক সময় কেবল নামমাত্র জোটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই পরিবর্তনই পিণ্ডারি ইতিহাসে মারাঠা যুগ থেকে স্বাধীন যুগে উত্তরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংক্রমণ পর্যায়কে নির্দেশ করে। যেকোনো ঐতিহাসিক সময়বিভাগের মতোই পিণ্ডারিদের "স্বাধীন যুগ" কিছুটা ইচ্ছামতো নির্ধারিত। তবে গবেষণার সুবিধার্থে ঐতিহাসিক ফিলিপ এফ ম্যাকএল্ডোনির এই সময়কালকে আনুমানিক ১৮০০ থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত ধরেছেন। এই দুই দশকে পিণ্ডারিরা এবং তাঁদের নেতারা প্রায় বাধাহীনভাবে লুঠতরাজ চালাতে থাকে, আর মারাঠা নেতৃত্ব খুব কম ক্ষেত্রেই তাদের ওপর এমনকি নামমাত্র নিয়ন্ত্রণও প্রয়োগ করতে পারত। এই কারণেই এই সময়কালকে "স্বাধীন যুগ" বলা যেতে পারে।

তবে বাস্তবে পিণ্ডারিরা এতটা শক্তিশালী ছিলেন না যে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারতেন, এবং তাঁরাও তা করতে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা যেহেতু এমন এক অঞ্চলে বসবাস করতেন যা মারাঠাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, তাই তারা কখনোই মারাঠাদের অস্পষ্ট বা আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেনি। ১৮১৫ সালের মধ্যে পিণ্ডারিরা একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হওয়ার পেছনে তিনটি প্রধান কারণ ছিল— প্রথমত, তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি, দ্বিতীয়ত তাঁদের সম্পদের বৃদ্ধি, এবং তৃতীয়ত, নতুন ও স্বাধীন নেতৃত্বের উত্থান।

পিণ্ডারিদের সংখ্যা কত ছিল তা নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ সেই সময়ে কোনো জনগণনা বা নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান ছিল না। ব্রিটিশ পর্যবেক্ষকেরা কখনো কখনো নিজের চোখে দেখে পিণ্ডারিদের সংখ্যা অনুমান করতেন, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করতেন। এই তথ্যগুলো সাধারণত বিভিন্ন দুরাহ বা পিণ্ডারি দলের (যেগুলো কোনো স্বীকৃত পিণ্ডারি নেতার অধীনে থাকত) সংখ্যা যোগ করে তৈরি করা হতো।

১৮১০ সালে বেরার দরবারে নিযুক্ত ব্রিটিশ প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন সিডেনহাম অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁর কাছে থাকা "অসম্পূর্ণ তথ্যের" কারণে তিনি পিণ্ডারিদের সম্পর্কে কোনো নিয়মিত বা সঠিক বিবরণ দিতে পারেননি।[১২] এর পাশাপাশি "পিণ্ডারি" বলতে ঠিক কাদের বোঝানো হবে তারও কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ছিল না। ফলে কিছু পর্যবেক্ষক যে সব পিণ্ডারিদলকে অন্তর্ভুক্ত করতেন, অন্যরা আবার সেগুলোকে বাদ দিতেন। কিছু প্রতিবেদনে কেবল নির্বাচিত কয়েকটি দলকে অন্তর্ভুক্ত করা হতো, আবার কিছু প্রতিবেদনে ওই অঞ্চলের সব ধরনের অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীকে পিণ্ডারি হিসেবে গণনা করা হতো। ফলে অধিকাংশ হিসাবই অস্পষ্ট, ভুল বা পরস্পরবিরোধী হয়ে পড়ে।

পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে এই কারণে যে পিণ্ডারিদের সংখ্যা তাদের লুঠতরাজের সাফল্য বা ব্যর্থতার ওপর নির্ভর করে বাড়ত বা কমত।[১৩] অনেক সময় দেখা যেত একটি নির্দিষ্ট লুঠ অভিযানে (*লুবার*) পিণ্ডারিদের সংখ্যা মূল সংখ্যার দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কারণ যাদের ওপর তারা লুটতরাজ চালাত, তাদের অনেকেই সবকিছু হারিয়ে হতাশায় সেই পিণ্ডারি দলে যোগ দিত। এছাড়াও সমাজের দুষ্কৃতকারী ও ভবঘুরে মানুষও সেই লুটকারী দলে যোগ দিত যখন তা তাদের এলাকার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করত।[১৪] ফলস্বরূপ, ১৮১২ সালে পিণ্ডারিদের সংখ্যা নিয়ে তিনটি আলাদা প্রতিবেদনে যথাক্রমে ২২,০০০, ২৬,০০০ এবং ৪৪,০০০ জনের হিসাব দেওয়া হয়েছিল।[১৫] তাই পিণ্ডারিদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা বেশ কঠিন।

এই সময়ে পিণ্ডারিদের জমি ও সম্পদের পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করাও সমানভাবে কঠিন। পূর্বে উল্লেখিত তিনটি প্রতিবেদনে পিণ্ডারিদের জমি থেকে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে

৮৩৪,০০০, ১,২০০,০০০ এবং ১,৯৫৭,০০০ টাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।[১৬] এর তুলনায় ১৮০০ সালের আগে তাদের বার্ষিক আয়ের একমাত্র উল্লেখিত পরিমাণ ছিল মাত্র ৫০,০০০ টাকা।[১৭]

পিণ্ডারিদের জমি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায় যে এই সময়ে মারাঠা প্রধানেরা— বিশেষত দৌলত রাও সিন্ধিয়া এবং যশবন্তরাও হোলকার— তাদের সামরিক সেবার বিনিময়ে পিণ্ডারি নেতাদের জমি দান করতেন। পিণ্ডারিরা এই অঞ্চলগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে সেগুলো আরও বিস্তৃত করার চেষ্টা করতেন। এইভাবে মধ্যভারতের নর্মদা নদীর ঠিক উত্তরে অবস্থিত জমির অধিকাংশই পিণ্ডারিদের জন্য স্থায়ী আয়ের উৎস হয়ে ওঠে। পাশাপাশি এগুলো তাদের পরিবারের বসবাসের স্থান এবং লুঠতরাজ পরিচালনার একটি কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করত।

মারাঠা যুগে প্রথম বাজীরাও এবং পরবর্তীকালে ভোঁসলে রাজাও পিণ্ডারিদের জমি দান করেছিলেন। তবে সেই জমিগুলো খুব দ্রুতই তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যায়। তাছাড়া সেগুলো স্বাধীন যুগে পিণ্ডারিদের অধীনে থাকা জমির মতো বিস্তৃত বা লাভজনক ছিল না।[১৮]

জমি থেকে প্রাপ্ত আয়ের পাশাপাশি পিণ্ডারি নেতারা মাঝে মাঝে নগদ অর্থও পেতেন, শর্ত ছিল যে তারা নির্দিষ্ট অঞ্চল লুঠ করবে না। তবে এই আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যও পাওয়া যায় না।[১৯] পিণ্ডারিরা শক্তিশালী হয়ে ওঠার পর তারা কখনও কখনও মধ্য ভারতের কোনো প্রধানকে লুঠতরাজের হুমকি দিয়েও অর্থ আদায় করত। ১৮১১ সালের দশেরা উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকের প্রতিবেদনে এই ধরনের ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎকালীন পিণ্ডারি নেতা করিম খান পিণ্ডারি অন্য এক পিণ্ডারি নেতা চিতু পিণ্ডারিকে পাশের ভোঁসলে রাজ্যের অঞ্চল লুঠ করার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চিতু এতে অংশ নিতে অস্বীকার করেন। যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় যে ভোঁসলে শাসক সম্ভবত চিতুকে একটি বড় অঙ্কের ঘুষ দিয়েছিলেন। ফলে সেই লুট অভিযান আর ঘটেনি।[২০]

লুঠতরাজ পিণ্ডারিদের আয় ও সম্পদের সবচেয়ে বড় উৎস ছিল, যদিও এটি স্থায়ী ছিল না। ঋণ পরিশোধ, আনন্দ উল্লাস এবং ভোগ বিলাসেই পিণ্ডারিদের দ্রুত লুঠ করা সম্পদ ব্যয় হয়ে যেত।[২১] যদি পিণ্ডারিরা আরও বিস্তৃতভাবে এবং দীর্ঘসময় ধরে লুঠতরাজ চালাত, তবে হয়তো তারা ভারতীয় অর্থনীতিতে এক ধরনের রূপান্তরও ঘটাতে পারত। তারা সাধারণত যে সম্পদ লুঠ করত তার বেশিরভাগই ছিল মূল্যবান গয়না অথবা নগদ অর্থ। অনেক সময় নির্যাতনের মাধ্যমে এই সঞ্চিত সম্পদ আদায় করা হতো। ফলে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা স্থবির সম্পদ আবার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবাহিত হতে শুরু করত এবং এর ফলে মুদ্রাস্ফীতিও ঘটতে পারত, এমনটা মনে করতেন ফিলিপ এফ ম্যাকএল্ডোনির।

পিণ্ডারিদের স্বাধীন শক্তি হিসেবে বিকাশের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল একটি নতুন ধরনের নেতৃত্বের আবির্ভাব। একদিকে পিণ্ডারি নেতৃত্ব আরও স্বাধীন হয়ে ওঠে, তবে তা এই কারণে নয় যে তারা বিশেষভাবে দক্ষ নেতা পেয়েছিল; বরং মধ্য ভারতে যে ক্ষমতার শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, সেই পরিস্থিতিতে তারা সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

এই সময়ে মারাঠাদের নেতৃত্বও তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পুনের পেশোয়া ইতিমধ্যেই ব্রিটিশদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, যেমন পরাজিত হয়েছিলেন দৌলত রাও সিন্ধিয়া। অন্যদিকে যশবন্তরাও হোলকার তাঁর স্বাধীনতা বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু ১৮০৮ সালে তাঁর মানসিক অসুস্থতা দেখা দেওয়ার পর তার দরবারে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং অন্যান্য শক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও দুর্বল হয়ে পড়ে।[২২]

এই সুযোগে পিণ্ডারিরা ধীরে ধীরে মারাঠা প্রধানদের প্রতি তাঁদের প্রধান আনুগত্য ও বাধ্যতা কমিয়ে এনে নিজেদের দুরাহ অর্থাৎ পিণ্ডারি দলের নেতাদের প্রতি বেশি অনুগত হয়ে পড়েন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পিণ্ডারি দলগুলোকে সহজেই চিহ্নিত করা যেত যে তাঁরা যশবন্তরাও হোলকার (হোলকারশাহী) অথবা দৌলত রাও সিন্ধিয়া (সিন্দিয়াশাহী) র অধীনে কাজ করে। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে এই মারাঠা প্রধানদের সঙ্গে পিণ্ডারিদের সম্পর্কও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সক্রিয় এবং বড় পিণ্ডারি দলগুলোর অধিকাংশই তখন নামমাত্রভাবে সিন্দিয়াশাহীর অধীনে ছিল। ফলে এই উপাধিটি ধীরে ধীরে তার গুরুত্ব হারায় এবং তার পরিবর্তে দুরাহ বা পৃথক পিণ্ডারি দলের পরিচয়ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[২৩] পিণ্ডারি নেতাদের ইতিহাস আরও কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে এই পরিবর্তনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

ঘাট-স-উদ্দীন ছিলেন প্রথম পিণ্ডারি যাকে মারাঠারা নিয়োগ করেছিলেন। তিনি প্রথম বাজিরাওয়ের অধীনে হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করেছিলেন। যখন হোলকার তাঁর সামরিক কৃতিত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেন, তখন তিনি এবং তাঁর এক পুত্র গার্দি খান হোলকারের দরবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এই পিণ্ডারি দলটি, তাদের বংশগত নেতৃত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরেও, স্বাধীন যুগ পর্যন্ত হোলকারদের অধীনেই থেকে যায়।

মানসিক অসুস্থতা দেখা দেওয়ার আগে যশবন্তরাও হোলকার পিণ্ডারিদের দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। সম্ভবত তিনি তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার পরিকল্পনাও করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন তুলসীবাই ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন তিনি পিণ্ডারিদের উপাধি ও জমি প্রদান করেন। এর ফলে পিণ্ডারিরা আরও শক্তিশালী অবস্থানলাভ করে।[২৪]

৩

স্বাধীন যুগে, কন্দির বখ্‌শের নেতৃত্বে থাকা এই পিণ্ডারি দলটি অন্য পিণ্ডারি দলগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় ছিল। শাহবাজ খান পিণ্ডারিদের দ্বিতীয় প্রধান শাখাটি সংগঠিত করেছিলেন, যা সাধারণত দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তিনি সিন্ধিয়ার হয়ে হিন্দুস্তানের একটি অভিযানে অংশগ্রহণের সময় মারা যান, তবে তার দলটি পরবর্তীতেও সিন্ধিয়া বংশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বজায় রাখে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে শাহবাজ খানের দুই পুত্র— হিরো এবং বারুন ভোপালের নবাবের কাছে তাদের সামরিক সেবা প্রদানের প্রস্তাব দেন। কিন্তু নবাব এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে দ্বিধা করলে নাগপুরের ভোসলে পরিবার তাদের নিয়োগ করে।

পিণ্ডারিদের প্রথম দায়িত্ব ছিল ভোপাল অঞ্চল লুঠ করা, এবং তারা অত্যন্ত উৎসাহ ও সাফল্যের সঙ্গে এই কাজ সম্পন্ন করেন। কিন্তু এই অভিযানে সংগৃহীত বিপুল লুঠের সম্পদ দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে ভোঁসলে রাজা পিণ্ডারিদের শিবিরেই আক্রমণ চালান এবং বারুনকে বন্দি করেন।[২৫] এই ঘটনার পর হিরো নিজের নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চিত হয়ে সিন্ধিয়ার কাছে পালিয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই, প্রায় ১৮০০ সালের দিকে, এই দুই নেতা মারা যান।

১৮০০ সালের পর সিন্ধিয়াশাহীর অধীনে বংশানুক্রমিক নেতৃত্বের গুরুত্বও অনেকটাই কমে যায়, যেমনটি হোলকার শাহীর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। এই সময়ে দুই নতুন নেতা করিম খান পিণ্ডারি এবং চিতু পিণ্ডারি উত্থিত হন। স্বাধীন যুগে এই দুই নেতাই পিণ্ডারিদের প্রধান নেতৃত্বে পরিণত হন।

করিম খান কিছু সময়ের জন্য সবচেয়ে ধনী ও শক্তিশালী পিণ্ডারি নেতা ছিলেন। তরুণ সৈনিক হিসেবে তিনি ধারাবাহিকভাবে পেশওয়া, সিন্ধিয়া এবং বারুনের অধীনে কাজ করেছিলেন। যখন ভোঁসলে রাজা বারুনকে বন্দি করেন, তখন করিম খান পালিয়ে গিয়ে সিন্ধিয়ার অধীনে যোগ দেন।

খড়দার যুদ্ধে হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়ে তিনি লুঠতরাজের মাধ্যমে বিপুল সম্পদ অর্জন করেন। এই নতুন অর্জিত সম্পদ রক্ষা করার জন্য তিনি মধ্য ভারতের শুজলপুর অঞ্চলে নিজের ঘাঁটি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি অনেক পিণ্ডারিকে নিজের অনুসারী হিসেবে আকর্ষণ করেন।

পরবর্তীতে ১৮০৪ সালে সিন্ধিয়া তার এই এলাকার ওপর কর্তৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেন। এই ভূমির বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। নিজেকে একজন রাজপুত্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে করিম খান পিণ্ডারি ভোপাল অঞ্চলে তার ক্ষমতাবিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এতে তিনি সফল হননি। ১৮০৬ সালে দৌলত রাও স্কিন্দিয়া করিম খানের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে তাকে নিজের শিবিরে প্রলুব্ধ করে ডেকে আনেন এবং বন্দি করে ফেলেন।[২৬]

এরপর করিম খানের মা তার ছেলের সংগৃহীত সম্পদ নিয়ে কোটার রাজপুত্র জালিম সিংয়ের কাছে আশ্রয় নেন। পরবর্তী পাঁচ বছর করিম খান সিন্ধিয়ার বন্দিত্বে থাকেন, আর এই সময়ে অন্যান্য পিণ্ডারি নেতারা তাদের ক্ষমতা আরও বিস্তার করতে থাকে।

স্বাধীন যুগের আরেকজন উল্লেখযোগ্য পিণ্ডারি নেতা ছিলেন চিতু পিণ্ডারি। দিল্লির কাছে এক জাট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ডোবলে খান, যার পুত্ররা বারুনের দুররাহ (পিণ্ডারি দল) পরিচালনা করত, তিনি চিতুকে একজন দাস হিসেবে কিনেছিলেন এবং পরে তাকে নিজের পুত্র হিসেবে দত্তক নেন। পরবর্তীকালে চিতু বারুনের দলের নেতৃত্ব অর্জন করেন।[২৭]

করিম খানের মতোই ১৮০৪ সালে সিন্ধিয়া চিতুকেও উপাধি ও জমি প্রদান করেন, কিন্তু ১৮০৭ সালে তাকেও বন্দি করে ফেলেন।[২৮]

১৮১১ সালে বড় অঙ্কের মুক্তিপণ দেওয়ার পর সিন্ধিয়া এই দুই নেতাকেই মুক্তি দেন। ওই বছরের দশেরা উৎসবের সময় তারা সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে শক্তির বিরুদ্ধে যৌথভাবে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু পূর্বে উল্লেখিতভাবে নাগপুরের ভোঁসলে শাসক চিতুকে জমি প্রদান করে নিজের দিকে টেনে নেন। ফলে চিতু সিন্ধিয়ার পক্ষে যোগ দেন এবং তার কর্মকর্তা জাগো বাপুকে সাহায্য করে করিম খানকে পরাজিত করেন।[২৯]

পরাজয়ের পর করিম খান আবার জালিম সিংয়ের কাছে আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে যান। কিন্তু একই সময়ে সিন্ধিয়া জালিম সিংকে হুমকি দেন যে তিনি যদি করিম খানকে আশ্রয় দেন, তবে প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

অবশেষে করিম খান সাহায্যের জন্য আমির খান পিণ্ডারি এবং হোলকার শক্তির কাছে যান। আলোচনার মাধ্যমে একটি সমঝোতা হয়, যার ফলে করিম খান ১৮১৬ সাল পর্যন্ত তাদের তত্ত্বাবধানে বা বন্দিত্বে থাকেন। পরে ওইবছরে মুক্তি পেলে তিনি চিতু পিণ্ডারির সাথে ঐক্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের পারস্পরিক বিরোধ ও দ্বন্দ্বের কারণে এই জোট বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি।

এই সময়ে ছোট ছোট দুররাহ (পিণ্ডারি দল)-এর নেতৃত্বে নমদার খান এবং ওয়াসিল মহম্মদ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। করিম খানের ভ্রাতুষ্পুত্র হিসেবে নমদার খান মাঝে মাঝে সিন্ধিয়ার অঞ্চলে লুটতরাজ চালাতেন, মূলত তার চাচার অপমান ও দমন-পীড়নের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।[৩০] তার দুররাহে প্রায় ২,০০০ জন সৈন্য ছিল, যেখানে করিম খানের দলে প্রায় ১০,০০০ জন ছিল। অন্যদিকে, হিরোর পুত্র ওয়াসিল মুহাম্মদ সাধারণত দৌলত রাও সিন্ধিয়ার প্রতি অনুগত ছিলেন এবং তার অধীনে প্রায় ৫,০০০ জনের একটি দুররাহ ছিল।[৩১]

এইভাবে পিণ্ডারি নেতৃত্ব তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও সম্পদ অর্জন করে ১৮০৪–০৬ সালের মধ্যে, যখন সিন্ধিয়া তাদের উপাধি প্রদান করেন এবং জমির অধিকার স্বীকৃতি দেন বা দান করেন। তবে একই সময়ে সিন্ধিয়া যে করিম খান ও চিতুকে একসময় বন্দি করেছিলেন, তা থেকেই বোঝা যায় যে তিনি তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন।

৪

পিণ্ডারিদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তাদের শক্তি যেমন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি তাদের পতনের বীজও তাদের নিজেদের মধ্যেই নিহিত ছিল। বিশেষ করে ১৮১১ ও ১৮১৭ সালের দশেরা সমাবেশে তাদের ঐক্যের অভাব এই দুর্বলতাকে প্রকট করে তোলে। করিম খান পিণ্ডারি, চিতু পিণ্ডারি প্রমুখ নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাস পিণ্ডারিদের একটি সুসংগঠিত শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে বাধা দেয়।

এই অভ্যন্তরীণ বিভাজনের সুযোগ নিয়েই মারাঠা শক্তি এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশরা কৌশলগতভাবে তাদের দুর্বল করে তোলে। কখনও ঘুষ, কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলিকে একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার—এই নীতির মাধ্যমে পিণ্ডারিদের ঐক্য সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দেওয়া হয়। ফলে তারা আর কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।

অবশেষে ব্রিটিশ শক্তি এই বিভক্ত ও দুর্বল পিণ্ডারিদের সহজেই দমন করতে সক্ষম হয় এবং এর মাধ্যমে মধ্য ভারতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। সুতরাং বলা যায়, পিণ্ডারিদের পতন শুধুমাত্র বাহ্যিক শক্তির ফল নয়; বরং তাদের অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা ও ঐক্যের অভাবই ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

তথ্যসূত্র:

[১] *McEldowney, Philip F. Pindari Society and the Establishment of British Paramountcy in India. University of Wisconsin, 1966, Madison, Wisconsin*

[২] *Malcolm, John. A Memoir of Central India. Kingsbury, Parbury & Allen, 1824, London, Vol. I, p. 433.*

[৩] *Renou, Louis. Hinduism. George Braziller, 1961, New York, p. 186.*

[৪] *Sen, Surendra Nath. The Military System of the Marathas. Orient Longmans, 1958, Bombay, pp. 73-74.*

[৫] *Scott, Jonathan. Firishta's History of the Deccan. John Stockdale, 1794, London, Vol. II, p. 122.*

[৬] *Manucci, Niccolao. Storia do Mogor. John Murray, 1907, London, Vol. II, p. 459.*

[৭] *Malcolm, John. A Memoir of Central India. Kingsbury, Parbury & Allen, 1824, London, Vol. I, p. 432 And Sen, Surendra Nath. The Military System of the Marathas. Orient Longmans, 1958, Bombay, p.74*

[৪] *Ross-of-Bladensburg, John Foster. The Marquess of Hastings and the Final Overthrow of the Maratha Power. Clarendon Press, 1900, Oxford, p. 51. And Yule, Henry and Arthur Coke Burnell. Hobson-Jobson: A Glossary of Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases. John Murray, 1903, London, p. 712.*

[৯] *Sen, Surendra Nath. The Military System of the Marathas. Orient Longmans, 1958, Bombay,* pp. 67-69.

[১০] Ibid, p. 73

[১১] Mehta, Mohan Sinha. *Lord Hastings and the Indian States*. Taraporevala Sons & Co., 1930, Bombay, p. 477.

[১২] *Great Britain, House of Commons. Parliamentary Papers. University of Wisconsin (Microcard Edition), 1818, London, Vol. XI, p. 246, Captain Sydenham, Letter, March 10, 1810.*

[১৩] Malcolm, *Central India*, I, p. 428-29.

[১৪] Malcolm, *Central India*, I, p. 429. And H.D. Sandeman, *Selections from Calcutta Gazettees* (Calcutta: 1869), vol. V, p. 192.

[১৫] *Jenkins, Richard. A Report by R. Jenkins, Resident at the Court of the Raja of Berar, June 21, 1812. In: Great Britain, House of Commons, Parliamentary Papers, 1818, London, Vol. XI, pp. 267-68.*

[১৬] *Gr. Br., P.P., 1818, XI, p. 267-68 of Jenkins' report.*

[১৭] *Gr. Br., P. P., 1818, XI, p. 273 of Jenkins' report.*

[১৮] George A.E. Fitzclarence, *Journal of a Route across India, through Egypt, to England* (London 1819), p. 5.

[১৯] Malcolm, *Central India*, I, p. 436.

[২০] *Prinsep, Henry T. A Narrative of the Political and Military Transactions of British India, under the Administration of the Marquess of Hastings. John Murray, 1820, London, p. 27*

[২১] *Malcolm, Central India, II, p. 178*

[২২] *V. Smith, Oxford History of India (London: 1958), p. 561.*

[২৩] *Gr. Br., P.P., 1818, XI, p. 271-75.*

[২৪] *Malcolm, Central India, I, p. 436-37.*

[২৫] *Ibid, p. 438-39. And Gr. Br., P.P., 1818, XI, p. 273,*

[২৬] *Prinsep, Narrative, p. 25-26.*

[২৭] *Malcolm, Central India, I, p. 440.*

[২৮] *Gr. Br., P.P., 1818, XI, p. 271, Jenkins' report.*

[২৯] *Gr. Br., P.P., 1819, XVIII, p. 665, Letter no. 8, March 1, 1812.*

[৩০] *Malcolm, Central India, I, p. 456.*

[৩১] *Ibid, p. 439*